করেই কীভাবে শূন্য থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হতে পারে। এবং এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার 'অলৌকিকত্ব' বলে কিছু নেই। তার ভাষায়-

'...অন্য কথায়, মহাবিশ্ব "সৃষ্টিতে" বাইর থেকে কোনও শক্তির প্রয়োজন হয়নি। অধিকন্তু, এটি হল মহাস্ফীতি মহাবিশ্বতত্ত্বেরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, যদি শূন্য শক্তির একটি প্রাথমিক শূন্যতা (void) থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে শক্তির নিত্যতা (energy conservation) লঙ্ঘিত হয় না।'[২২]

সুপ্রিয় পাঠক, আপনারা খেয়াল করবেন– শূন্য থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছেই এমন কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না। যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি 'হতে পারে এবং সাম্প্রতিক গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের সাথে মোটেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শেষ কথা বলবার সময় এখনও আসে নি। শেষ কথা বলতে পারে বিজ্ঞান। এ জন্য আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে গত্যন্তর নেই।

অতি সম্প্রতি বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় মতবাদটি হলো ঃ 'বুদ্ধিদীপ্ত নকশাভিত্তিক যুক্তিবাদ' (Intelligent Design argument)। এটি মূলতঃ পিলের ডিজাইন যুক্তিবাদেরই বর্ধিত রূপ। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এদের যুক্তি হলো আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন কিছু পরিবর্ত রাশির (variables) সূক্ষ্ম সমন্বয়ে বা টিউনিংয়ে (fine tuning) সৃষ্ট হয়েছে যে এই সমন্বয়ের একচুল হের ফের হলে আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হতো না। এর অর্থ হলো সৃষ্টির এক পর্যায়ে তিনি প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই সুপ্ত ইচ্ছেটা মনে রেখে তিনি মহাবিশ্ব তৈরি করলেন, আর এ কারণেই আমাদের মহাবিশ্ব ঠিক যেমনটি আছে তেমন; এত নিখুঁত ও সুসংবদ্ধ। ব্যাপারটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ধরা যাক মহাকর্ষণের কথা। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে একটি ধ্রুবক স্বতঃভাবেই উদয় হয়- যাকে আমরা বলি মহাকর্ষ ধ্রুবক (Gravitational Constant)। সেই সূত্র থেকে দেখা যায় যে দু'টি বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণ নির্ধারিত হবে ওই মহাধ্রুবকের সংখ্যাবাচক মান দ্বারা। যদি ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হতো তাহলে দু'টি কণিকার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণও বদলে যেত। সাদা চোখে ব্যাপারটি সামান্য মনে হতে পারে। আকর্ষণ বলের তারতম্য ঘটলে এমন কি এসে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এটি সামান্য নয়- এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। তারা বলেন যে ওই মহাকর্ষ ধ্রুবকের বর্তমান মান আসলে আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ধ্রুবকটির মান অন্যরকম হলে তারকাদের মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে বদলে দিত। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই মহাকর্ষ ধ্রুবকের অবশ্য উপরই নয়, মহাকর্ষ ও দুর্বল নিউক্লিয় বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশ নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন যে দুর্বল নিউক্লিয় বলের শক্তি যদি সামান্য একটু বেশি হতো, এই মহাবিশ্ব পুরোটাই অর্থাৎ শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেন পরমাণুতে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটোরিয়াম (এটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কাজিন, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'আইসোটোপ') হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার এর উল্টোটি ঘটলে, অর্থাৎ দুর্বল নিউক্লিয় বলের শক্তিমত্তা আর একটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে কেবল থাকত শতকরা একশ ভাগ হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন তৈরিতে বাধা দিত। কাজেই এ ধরনের দুই চরম অবস্থার যে কোনও একটি ঘটলে মহাবিশ্বে কোনও নক্ষত্ররাজি তৈরি হওয়ার মতো অবস্থা কখনও সৃষ্টি হতো না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে 'কার্বন-ভিত্তিক' প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে ইলেকট্রনের ভর নিউট্রন ও প্রটোনের ভরের অন্তরের চেয়ে কিছুটা কম। তারা মনে করেন যে এর ফলে একটি মুক্ত নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও প্রতি-নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশি হতো, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপাদিত সকল আর প্রটোন মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হতো। এর ফলে যা ঘটত সেটি আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু হতো না। এমনতর পরিস্থিতিতে খুব কম পরিমাণ হাইড্রোজেন টিকে থাকত, আর তাহলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি অবশিষ্ট থাকত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের রহস্যময় নানা 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছিলেন ১৯৮৬ সালে, নাম 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাদের বক্তব্য হলো, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল কিংবা অন্য মহাজাগতিক ধ্রুবকসমূহের মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বেও চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে-- এর উত্তর পেতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের আবির্ভাবের মধ্যে। ধরাধামে প্রাণের বিকাশ ও সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অভ্যুদয়ের জন্য এসব মৌলিক ধ্রুবক ও পরিবর্ত রাশিগুলোর (variables) মান ঠিক এমনই হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল, আর সেজন্যই ধ্রুবকগলির মান এ রকম হয়েছে। হঠাৎ করে বা দৈবক্রমে (accidentally) এটি ঘটে নি, বরং এর পেছনে বিধাতা পুরুষের একটি সুস্পষ্ট নিহিত ছিল। মানুষের অভ্যুদয়কে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-নীতি-সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা করার এই প্রয়াসকে বলা হয় 'Anthropic arguments' বা 'নৃ-কেন্দ্রিক যুক্তিবাদ'।

এ ধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলেও অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ এ ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হয়েছে যে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বনভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া অন্য কোনওভাবে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। যেমন প্রায়শঃ বলা হয় যে পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি যথাযথ অনুপাতে না থাকত, তবে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীর কক্ষ-তল বিষুববৃত্তের তলের সাথে ২৩.৫ ডিগ্রী হেলে আছে, তার একচুল এদিক-ওদিক হলে তাপ ও চাপের অনুপাতের এমন তারতম্য দেখা দিত যে প্রাণের উন্মেষ একটি অসম্ভব ব্যাপারেও পরিণত হতো। কিন্তু বেশকিছু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাণের এ ধরনের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার সাথে একমত নন। এদের মতে, 'আমরা এ ধরনের সর্বোত্তম' পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছি বলেই আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক এ ধরনের পরিবেশই লাগবে। অর্থাৎ বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির উপস্থিতি, আবহমণ্ডলের চাপ, তাপ ইত্যাদি পরিবেশ নির্ধারক পরিবর্ত রাশিগুলোর মান বর্তমানে যা আছে তা না থাকলে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না, ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত (intutive) ধারণা—প্রমাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন রক্ষার অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রেও গভীর তলদেশে এমনকি কেরোসিন তেলের ভেতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে যে ধরনের পরিবেশের সাথে আসলে পরিচিত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনও মিলই নেই। কাজেই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর পরিবর্ত রাশিগুলোর মান অন্যরকম হলে মহাবিশ্বে প্রাণের অভ্যুদয় ঘটত না। খ্যাতনামা জ্যোতির্পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেংগর তাঁর"The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology" বইটিতে দেখিয়েছেন যে মহাজাগতিক ধ্রুবক আর পরিবর্ত রাশিগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের মহাবিশ্বের মতো আরও অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মতো পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য 'ফাইন টিউনিংয়ের' কোনও প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারটি বুঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলোর নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত "Anthropic